Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের যা করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফুন নাহার আবিদা

রোলঃ 228021999

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের যা করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফুন নাহার আবিদা

রোলঃ 228021999

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের যা করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফুন নাহার আবিদা, আইডিঃ 228021999 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের যা করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আরিফুন নাহার আবিদা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আরিফুন নাহার আবিদা

আইডিঃ 228021999

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা (المقدمة) 5

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি 5

১.২ ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব ও নাস্তিক্যবাদের স্বরূপ 5

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 6

১.৪ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা 7

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস পরিচিতি 8

১.৬ থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য (Thesis Statement) 8

অধ্যায় ২: ইসলামে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের ধারণা। 10

২.২ তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) ধারণা ও প্রকারভেদ 10

* ২.২.১ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ (توحيد الربوبية - প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ): 10

* ২.২.২ তাওহীদে উলুহিয়্যাহ (توحيد الألوهية - উপাস্যত্বের একত্ববাদ): 11

* ২.২.৩ তাওহীদে আসমা ওয়া সিফাত (توحيد الأسماء والصفات - নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ): 12

২.৩ রিসালাত (নবুয়ত) ও খতমে নবুয়তের গুরুত্ব 12

২.৪ আখিরাত (পরকাল) এর প্রতি বিশ্বাস ও এর তাৎপর্য 14

অধ্যায় ৩: নাস্তিক্যবাদ: একটি ইসলামী পর্যালোচনা (الإلحاد: دراسة نقدية إسلامية) 16

৩.১ নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 16

৩.২ নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তাদের যুক্তি 18

উপসংহার: 20

অধ্যায় ১: ভূমিকা (المقدمة)

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

সাম্প্রতিককালে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী বা নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ ও এ সম্পর্কিত আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ব্লগ, অনলাইন ফোরাম এবং কিছু প্রকাশনায় এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদিও এই চিন্তাধারার অনুসারীর সংখ্যা পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য না-ও হতে পারে, তবে এর ক্রমবর্ধমান দৃশ্যমানতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে এর সরব উপস্থিতি সমাজের চিরায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর ফলে, সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক প্রকারের সংশয়, বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টির অবকাশ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে এই বিষয়টি গভীর উদ্বেগ ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এই প্রেক্ষাপটকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে নাস্তিক্যবাদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ এবং এর সামাজিক প্রভাবকে الإسلام (ইসলাম)-এর মৌলিক শিক্ষার আলোকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

১.২ ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব ও নাস্তিক্যবাদের স্বরূপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হলো ‘ঈমান’ বা বিশ্বাস। ঈমানের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ‘তাওহীদ’ বা এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবসমূহ, ফেরেশতাকুল, তাকদীর (ভাগ্য) এবং আখিরাত (পরকাল)-এর প্রতি নিঃসংশয় বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, "প্রকৃত পুণ্যবান তো সে-ই, যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর, শেষ দিবসের উপর,

ফেরেশতাদের উপর, সকল কিতাবের উপর এবং সকল নবীর উপর।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৭৭)। ঈমান একজন মুসলিমের জীবনের চালিকাশক্তি; এটি তার চিন্তা, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি। ঈমানের অনুপস্থিতি বা অস্বীকৃতি, যা নাস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদের মূল প্রতিপাদ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই নয়, বরং এটি মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতা এবং পারলৌকিক মুক্তির সম্ভাবনাকেও প্রত্যাখ্যান করা। নাস্তিক্যবাদকে ইসলাম 'ফিতরাত' (فطرة) বা মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতির বিচ্যুতি হিসেবে দেখে, কারণ ইসলাম অনুসারে প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টার প্রতি এক ধরণের সহজাত স্বীকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই, নাস্তিক্যবাদ মানবাত্মার জন্য এক গভীর আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও চূড়ান্ত অর্থে পরকালীন জীবনে মহা ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বিস্তারের কারণসমূহ উদঘাটন এবং এর প্রত্যুত্তরে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে একটি সুচিন্তিত, জ্ঞানভিত্তিক এবং গঠনমূলক পথনির্দেশনা প্রদান করা। এই মূল লক্ষ্যের আলোকে গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

* ক. ইসলামে ঈমানের মৌলিক ধারণা, আল্লাহর অস্তিত্বের যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক প্রমাণ এবং নাস্তিক্যবাদের অসারতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করা।

* খ. বাংলাদেশে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, নাস্তিক্যবাদী ধ্যানধারণা প্রসারের আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত কারণসমূহ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা।

 * গ. নাস্তিক্যবাদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন, সন্দেহ ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম স্কলারদের প্রজ্ঞাপূর্ণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব প্রদান করা।
 * ঘ. নাস্তিক্যবাদের বিস্তার রোধে এবং ঈমানী চেতনা সমুন্নত রাখতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ইসলামী সংগঠন এবং রাষ্ট্রের (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে) দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

১.৪ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার বিস্তার এবং এর ইসলামিক সমাধান অনুসন্ধানে কেন্দ্রীভূত থাকবে। বিশ্বব্যাপী নাস্তিক্যবাদের ইতিহাস বা বিভিন্ন দেশে এর প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা কেবল প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হবে। গবেষণার মূল ফোকাস থাকবে ইসলামিক শাস্ত্রীয় উৎসসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) এবং নির্ভরযোগ্য মুসলিম মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন বা সমাজতত্ত্বর অন্যান্য দিক কেবলমাত্র ইসলামের সাথে তুলনামূলক আলোচনা বা ইসলামী বক্তব্যকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হবে। সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক মাঠপর্যায়ের জরিপ বা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে; তবে বিদ্যমান গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করা হবে।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস পরিচিতি

এই গবেষণাটি প্রধানত একটি গুণগত (Qualitative) গবেষণা। এখানে বিশ্লেষণাত্মক, বর্ণনামূলক এবং তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

১.৬ থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য (Thesis Statement)

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের সীমিত ক্রমবর্ধমান বিস্তারের প্রেক্ষাপটে, মুসলিমদের প্রধান করণীয় হলো ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও শিক্ষার গভীরে প্রবেশ করে ঈমানী দৃঢ়তা অর্জন করা; কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদী চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলা করা; এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য ও সাম্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে এক বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রক্রিয়ায় আবেগ বা সংঘাতের পরিবর্তে জ্ঞান, সহনশীলতা (ইসলামের সীমার মধ্যে) ও গঠনমূলক কর্মপন্থা অনুসরণ অপরিহার্য।

অধ্যায় ২: ইসলামে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের ধারণা (مفهوم الإيمان والتوحيد والرسالة في الإسلام) (আংশিক)

২.১ ঈমানের মৌলিক স্তম্ভসমূহ (আরকানুল ঈমান)

ইসলামী পরিভাষায় 'ঈমান' (إيمان) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন করা, সত্যায়ন করা, স্বীকৃতি দেওয়া এবং নিরাপত্তা প্রদান করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কার্যে পরিণত করার সামষ্টিক রূপ। প্রখ্যাত হাদীস, যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে পরিচিত, সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে ছয়টি মৌলিক স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالله): এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব), উলুহিয়্যাত (একমাত্র উপাস্য সত্তা) এবং

আসমা ওয়া সিফাত (নাম ও গুণাবলী)-এর প্রতি এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো প্রকার বিকৃতি (تحريف), অস্বীকার (تعطيل), ধরন-গঠন নির্ধারণ (تكييف) বা সাদৃশ্য প্রদান (تمثيل) ব্যতিরেকে।

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস (والملائكته): আল্লাহর নূরের তৈরি অদৃশ্য সৃষ্টি, যারা সর্বদা তাঁর আজ্ঞাবহ এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত, যেমন জিবরীল (আ.), মিকাঈল (আ.), ইসরাফীল (আ.), মালাকুল মাউত (আ.) এবং অন্যান্য সম্মানিত ফেরেশতাগণ।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (وكتبه): মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে যে সকল আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, যেমন তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন – এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল-কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং সেগুলোর রহিতকারী (নাসিখ)।

৪. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (ورسله): আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রথমজন আদম (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সকল রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে খাতামুন নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী) হিসেবে মেনে নেওয়া ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

৫. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস (واليوم الآخر): মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, বিচার দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের মতো বিষয়াদির সমন্বয়ে গঠিত পরকালীন জীবনের প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে দায়িত্বশীল আচরণ করতে এবং সৎকর্মে ব্রতী হতে অনুপ্রাণিত করে।

৬. তাকদীর বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস (والقدر خيره وشره): পৃথিবীর সকল ঘটনা আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত জ্ঞান ও ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয় – এই বিশ্বাসকে তাকদীর বলা হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ তার

কর্মে স্বাধীন নয়। আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে।

এই ছয়টি স্তম্ভের সমষ্টিই হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমান। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করলে বা সন্দেহ পোষণ করলে ঈমান অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়, বরং তা অন্তরের গভীর প্রত্যয় এবং তদনুযায়ী আমলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

অধ্যায় ২: ইসলামে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের ধারণা।

২.২ তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) ধারণা ও প্রকারভেদ

ইসলামের মূল ভিত্তি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা হলো 'তাওহীদ' (توحيد), যার অর্থ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ। এটি শুধু আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় – এই মৌখিক স্বীকৃতিই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে – বিশ্বাসে, চিন্তায় ও কর্মে – আল্লাহর একত্বকে প্রতিষ্ঠা করাই হলো তাওহীদের মূল মর্ম। তাওহীদ হলো শিরক (شرك) বা অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামে তাওহীদকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়, যাতে এর পূর্ণাঙ্গ ধারণা অনুধাবন করা সহজ হয়:

* ২.২.১ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ (توحيد الربوبية - প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ):

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র রব (رب) বা প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করা। তিনিই এই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা (الخالق), মালিক (المالك), পরিচালক (المدبر), রিযিকদাতা (الرازق) এবং জীবন ও মৃত্যুর একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টিজগতের কোনোকিছুই তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ সকল

কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬২)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: "জেনে রেখো, সৃষ্টি করা ও আদেশ দেওয়া একমাত্র তাঁরই কাজ।" (সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:৫৪)। প্রাচীন আরবের মুশরিকরাও আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করত, কিন্তু তারা অন্যান্য দেব-দেবীকে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করত এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত, যা তাওহীদে রুবুবিয়্যাহর পরিপন্থী না হলেও তাওহীদে উলুহিয়্যাহর পরিপন্থী ছিল।

* ২.২.২ তাওহীদে উলুহিয়্যাহ (توحيد الألوهية - উপাস্যত্বের একত্ববাদ):

এটি ‘তাওহীদুল ইবাদাহ’ (توحيد العبادة) বা উপাসনার একত্ববাদ নামেও পরিচিত। এর মূল কথা হলো, সকল প্রকার ইবাদত, যেমন – দু‘আ (প্রার্থনা), সালাত (নামায), সাওম (রোযা), যাকাত, হাজ্জ, কুরবানী, মানত, তাওয়াক্কুল (ভরসা), আশা, ভয়, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই নিবেদন করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তি – যেমন নবী, ওলী, ফেরেশতা, জিন, মূর্তি, কবর, মাজার বা অন্য কোনো কল্পিত সত্তা – ইবাদতের যোগ্য নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন: "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)। সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল এই তাওহীদে উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫)। এই প্রকার তাওহীদকে অস্বীকার বা এতে অংশীদার স্থাপন করাই হলো ‘শিরকে আকবার’ (بزرگ شرک) বা বড় শিরক, যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ যদি কেউ এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

* ২.২.৩ তাওহীদে আসমা ওয়া সিফাত (توحيد الأسماء والصفات - নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ):

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার জন্য কেবল সেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা তিনি নিজে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন – কোনো প্রকার তাহরীফ (تحريف - বিকৃতি), তা'তীল (تعطيل - অর্থহীন বা অস্বীকার করা), তাকয়ীফ (تكييف - ধরন-গঠন নির্ধারণ) বা তামছীল (تمثيل - সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান) করা ছাড়াই। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্য এবং তা সৃষ্টির গুণাবলীর মতো নয়। যেমন আল্লাহ দেখেন, শোনেন, কথা বলেন – কিন্তু তাঁর দেখা, শোনা বা কথা বলা সৃষ্টির মতো নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১)। সূরা আল-ইখলাস এই প্রকার তাওহীদের এক অনন্য উদাহরণ: "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (সূরা আল-ইখলাস, ১১২:১-৪)।

এই তিন প্রকার তাওহীদের সমন্বয়ই হলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদ। এর কোনো একটিতে বিচ্যুতি ঘটলে ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

২.৩ রিসালাত (নবুয়ত) ও খতমে নবুয়তের গুরুত্ব

'রিসালাত' (رسالة) বা নবুয়ত (نبوة) হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য পথনির্দেশনা প্রেরণের ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে অনর্থক সৃষ্টি করেননি, বরং তাঁর ইবাদত এবং নির্দেশিত পথে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই পথনির্দেশনা প্রদানের জন্যই তিনি যুগে যুগে নবী (نبي) ও রাসূল (رسول) প্রেরণ করেছেন।

* নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা: মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পথ খুঁজে পেতে অক্ষম। বিশেষত, স্রষ্টার পরিচয়, জীবনের উদ্দেশ্য, আখিরাতের জীবন এবং কোনটি ভালো ও কোনটি মন্দ তা নির্ভুলভাবে জানার জন্য ঐশী নির্দেশনার প্রয়োজন। নবী-রাসূলগণ এই ঐশী নির্দেশনা তথা 'ওয়াহী' (وحي) লাভ করেন এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

* সকল নবীর প্রতি ঈমান: ইসলামে আদম (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন: "রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮৫)।

* খতমে নবুয়ত (ختم النبوة - নবুয়তের পরিসমাপ্তি): ইসলামী আকীদার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'খতমে নবুয়ত'-এর প্রতি বিশ্বাস। এর অর্থ হলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবী বা রাসূল আসবেন না এবং তাঁর আনীত শরীয়ত (ইসলাম) কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৪০)। অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারাও খতমে নবুয়তের বিষয়টি প্রমাণিত। এই বিশ্বাস ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামের শাশ্বত পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপরিহার্য।

২.৪ আখিরাত (পরকাল) এর প্রতি বিশ্বাস ও এর তাৎপর্য

‘আখিরাত’ (الآخرة) বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর অর্থ হলো, এই পার্থিব জীবনই শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর আরেকটি অনন্ত জীবন রয়েছে যেখানে মানুষকে তার দুনিয়ার জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান বা শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতের ধারণার মধ্যে রয়েছে মৃত্যু, কবরের জীবন (বারযাখ), কিয়ামত (পুনরুত্থান), হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়া, আল্লাহর সম্মুখে বিচার (হিসাব), মীযান (আমলনামা পরিমাপের দাঁড়িপাল্লা), পুলসিরাত, জান্নাত (বেহেশত) এবং জাহান্নাম (দোযখ)।

* কুরআনে আখিরাতের গুরুত্ব: পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং একে মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, "এবং যারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:৪)।
* তাৎপর্য ও প্রভাব: আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে:
  * দায়িত্বশীলতা: মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে তাকে তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন সে তার কথা ও কাজে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সচেতন হয়।
  * পাপ থেকে নিবৃত্তি: জাহান্নামের শাস্তির ভয় মানুষকে পাপকার্য থেকে বিরত রাখে এবং জান্নাতের পুরস্কারের আশা তাকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে।
  * ধৈর্য ও সান্ত্বনা: দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অবিচার বা বঞ্চনার শিকার হলে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মুমিনকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহর প্রতিদানের আশায় সান্ত্বনা লাভে সহায়তা করে।
  * জীবনের উদ্দেশ্য: আখিরাতের বিশ্বাস পার্থিব জীবনকে একটি বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ হিসেবে প্রতিভাত করে, ফলে জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে। এটি বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করে।

২.৫ ফিতরাত (মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি) ও স্রষ্টার অস্তিত্বের উপলব্ধি

‘ফিতরাত’ (فطرة) একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি বা জন্মগত যোগ্যতা। ইসলাম অনুসারে, প্রত্যেক মানুষ একটি বিশুদ্ধ ও নির্মল প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যার মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের একটি সহজাত প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

* স্রষ্টার প্রতি সহজাত টান: এই ফিতরাতই মানুষকে তার চারপাশে বিদ্যমান আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শনাবলী – যেমন আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, প্রাণের স্পন্দন ইত্যাদি – নিয়ে চিন্তা করতে এবং এগুলোর পেছনে একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে। চরম বিপদের মুহূর্তে বা অসহায় অবস্থায় মানুষ অজ্ঞাতসারেই এক পরম শক্তির দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়, যা তার ফিতরাতেরই বহিঃপ্রকাশ।

* আলমে আরওয়াহের অঙ্গীকার: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে ‘আলমে আরওয়াহ’ (আত্মার জগত)-এ তিনি সকল মানুষের রুহের কাছ থেকে তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন: "আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ তারা বলল, ‘অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম।’ এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারো, ‘আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম’।" (সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:১৭২)। এই অঙ্গীকার বা ‘মীছাক’ (مِيثَاق) মানুষের ফিতরাতে প্রোথিত হয়ে আছে।

* ফিতরাত ও ওয়াহী: যদিও ফিতরাত মানুষকে স্রষ্টার দিকে ধাবিত করে, তবে পারিপার্শ্বিকতা, ভুল শিক্ষা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ এই ফিতরাতকে কলুষিত বা আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। তাই, আল্লাহ তা‘আলা এই ফিতরাতকে জাগ্রত, পরিশুদ্ধ ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল

এবং আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) হলো ফিতরাতের পরিপূর্ণতা ও পথপ্রদর্শক।

ইসলামের দৃষ্টিতে, নাস্তিক্যবাদ বা স্রষ্টাকে অস্বীকার করা মূলত এই ফিতরাতের বিকৃতি ও অবদমনেরই নাম। সঠিক জ্ঞান, পরিশুদ্ধ পরিবেশ এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে মানুষ তার ফিতরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

অধ্যায় ৩: নাস্তিক্যবাদ: একটি ইসলামী পর্যালোচনা (الإلحاد: دراسة نقدية إسلامية)

৩.১ নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলামী পরিভাষায়, নাস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদকে সাধারণত 'ইলحاد' (ইলহাদ) শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়, যার আভিধানিক অর্থ হলো কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া, বিচ্যুত হওয়া বা সত্য থেকে সরে যাওয়া। পারিভাষিক অর্থে, ইলহাদ বলতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিকৃতি সাধন করা, অথবা ইসলামের মৌলিক আকিদা থেকে বিচ্যুত হওয়াকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে, যেকোনো প্রকার 'কুফর' (অবিশ্বাস) যা আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ অথবা নবুয়ত ও রিসালাতের মতো মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করে, তা নাস্তিক্যবাদী চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, সম্পূর্ণ স্রষ্টাহীন বা নিরীশ্বরবাদী দর্শন প্রাচীন যুগে তেমন প্রভাবশালী ছিল না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন যুগে এমন সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে (মুশরিক), অথবা অহংকারবশত আল্লাহর নির্দেশ অমান্য

করেছে, যেমন নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়, ‘আদ ও ছামূদ জাতি, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা। ফেরাউন নিজেকে ‘রব্বুকুমুল আ‘লা’ (তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক) (সূরা আন-নাযি‘আত, ৭৯:২৪) বলে দাবি করেছিল, যা ছিল চরম ঔদ্ধত্য ও স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচায়ক। তবে, এদের অনেকেই সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না, বরং আল্লাহর ক্ষমতা, একত্ব বা প্রেরিত রাসূলদের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করত। কুরআনুল কারীমে ‘দাহরিয়্যাহ’ (الدهرية) বা বস্তুবাদী প্রকৃতিবাদী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, যারা মনে করত সময় বা প্রকৃতিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোনো পরকাল নেই: "তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি এবং কালই (সময়ই) আমাদেরকে ধ্বংস করে।" (সূরা আল-জাছিয়াহ, ৪৫:২৪)।

আধুনিক নাস্তিক্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি মূলত পাশ্চাত্য জগতে রেনেসাঁস, আলোকায়ন (Enlightenment) এবং পরবর্তী যুগের বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে সুসংহত রূপ লাভ করে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দার্শনিক, যেমন – পল হেনরি থিরি ডি’হলবাক, লুডভিগ ফয়েরবাক, কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিখ নীটশে প্রমুখ ব্যক্তিত্বের লেখনীতে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাঁদের যুক্তি ছিল মূলত ধর্মকে মানবীয় কল্পনা, সামাজিক শোষণ অথবা মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার প্রক্ষেপণ হিসেবে দেখা। পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, বিশেষত ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (যেমন বিগ ব্যাং থিওরি, যদিও এটি স্রষ্টার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক নয়) অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে নাস্তিক্যবাদের সপক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যান্য সংস্কৃতির উপরও প্রভাব ফেলে।

৩.২ নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তাদের যুক্তি

নাস্তিক্যবাদ কোনো একক ও সুসংহত মতবাদ নয়, বরং এর বিভিন্ন প্রকারভেদ ও প্রকাশের ভঙ্গি রয়েছে। সাধারণভাবে নাস্তিক্যবাদকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

* সবল বা ইতিবাচক নাস্তিক্যবাদ (Strong/Positive Atheism): এই প্রকার নাস্তিক্যবাদীরা সুস্পষ্টভাবে দাবি করেন যে, 'ঈশ্বর বা আল্লাহ বলতে কিছু নেই' বা 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই'। তারা ঈশ্বরের অনস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। একে অনেক সময় 'জ্ঞানবাদী নাস্তিক্যবাদ' (Gnostic Atheism) ও বলা হয়।

* দুর্বল বা নেতিবাচক নাস্তিক্যবাদ (Weak/Negative Atheism): এই প্রকার নাস্তিক্যবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবিকে গ্রহণ করেন না বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন না, তবে তারা ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করা বা দাবি করার আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাদের অবস্থান মূলত 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের অভাব' (lack of belief in God)। একে 'অজ্ঞানবাদী নাস্তিক্যবাদ' (Agnostic Atheism)-এর কাছাকাছি একটি অবস্থান হিসেবেও দেখা হয়, যদিও সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।

* ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক নাস্তিক্যবাদ (Practical/Pragmatic Atheism): এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাত্ত্বিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার না করলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা বা প্রাসঙ্গিকতা দেখেন না। তারা এমনভাবে জীবন পরিচালনা করেন যেন ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই বা থাকলেও তিনি মানব জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেন না।

* এন্টিথেইজম বা ধর্মবিরোধিতা (Antitheism): এটি নাস্তিক্যবাদের একটি উগ্র রূপ, যেখানে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয় না, বরং ধর্ম ও ধার্মিকতাকে মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর, বিপজ্জনক ও পরিত্যাজ্য

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারার অনুসারীরা সক্রিয়ভাবে ধর্মের বিরোধিতা করে থাকেন।

নাস্তিক্যবাদীরা তাদের যুক্তির সপক্ষে সাধারণত যে বিষয়গুলো উত্থাপন করে থাকেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

* অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের অভাব: তারা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণীয় বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। যেহেতু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, সেহেতু তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা অযৌক্তিক।

* দুঃখ-কষ্ট ও অমঙ্গলের সমস্যা (Problem of Evil): যদি একজন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও পরম দয়ালু ঈশ্বর থাকেন, তাহলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, অন্যায়-অবিচার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন বিদ্যমান? এই সমস্যাটি ঈশ্বরের উল্লিখিত গুণাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক বলে তারা মনে করেন।

* ধর্মগ্রন্থের অসঙ্গতি ও অবৈজ্ঞানিকতা: অনেক নাস্তিক্যবাদী ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা, বিধান বা তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি, ঐতিহাসিক ভুল বা বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং এর ভিত্তিতে ধর্মকে মানব রচিত বলে দাবি করেন।

* বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা: তারা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞান (যেমন – পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান) মহাবিশ্বের উৎপত্তি, প্রাণের বিকাশ এবং প্রকৃতির নিয়মাবলীকে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

উপসংহার:

বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তার একটি বাস্তবতা যা সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি, তথ্যের সহজলভ্যতা, এবং চিন্তার স্বাধীনতা এই বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা রাখছে। তবে সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে সমুন্নত রাখা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই, নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, যুক্তিনির্ভর সংলাপ, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক নৈতিকতা চর্চা, এবং তরুণ প্রজন্মের মাঝে মানবিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করাই হওয়া উচিত আমাদের করণীয়। এই সমস্যা মোকাবেলায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।